Deba Prasad Das

Deba Prasad Das

আমার ছেলেবেলা

কলকাতায় থাকাকালীন আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব মহলে আমার ডাক নাম ছিল ''মানা''। পরে যখন কলকাতা ছেড়ে বাবুকাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সাথে আমি বম্বেতে কাজ করতে যাই, তখন বাবু কাকার মুখে 'মানা' ডাক শুনে শুনে বম্বের সুরকার, গীতিকার এবং অপরাপর সকলেই আমাকে ঐ নামেই ডাকতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁদের ঐ হিন্দী উচ্চারণে 'মানা'র 'না'তে দ্বিত্ব প্রভাবে ওটা হয়ে যেত 'ন্না'। অর্থাৎ 'মানা' হয়ে যেত ''মান্না''। এভাবেই বম্বের শিল্পী মহলে আমার ''মান্না'' নামটি চালু হয়ে গেল। ক্রমে রেকর্ডের লেবেলেও আমার নাম কখনো 'মোনা দে', কখনো 'মানা দে', কখনো বা 'মান্না দে' ছাপা হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত ঐ 'মান্না দে' নামটিই গ্রমোফোন কোম্পানী এবং ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রীতে পাকা হয়ে গেল। এবং মহানায়ক উত্তম কুমারকে যেমন অরুণ চট্টোপাধ্যায় ব'লে আজ আর চিনবার কোন উপায় নেই, তেমনি ''মান্না দে'র আড়ালে হারিয়ে গেছে আমার আসল নাম প্রবোধ চন্দ্র দে।

আমার জন্ম উত্তর কলকাতার সিমলা পাড়ার ৯ নম্বর মদন ঘোষ লেনে। আমাদের এ বাড়ী একটি অতি পুরানো বাড়ী। আমার ঠাকুর্দা ৺শিবচন্দ্র দে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এ বাড়ী তৈরী করেন। উনি নিজে কখনো গান বাজনা করেন নি। কিন্তু যথেষ্ট সংস্কৃতিবান মানুষ ছিলেন। শিবচন্দ্রের বড় ছেলে আমার বাবা ৺পূর্ণচন্দ্র দে, মেজো ৺হেমচন্দ্র এবং ছোটি ছেলে ৺কৃষ্ণচন্দ্র দে। ওরা সকলে খুবই দুঃখ দারিদ্রের মধ্য দিয়ে মানুষ হয়ে ছিলেন। কারণ সংসার পত্তনের শুরুতেই হঠাৎ একদিন যখন আমার ঠাকুর্দার অকাল প্রয়াণ হয়, আমার বাবার বয়স তখন সবে ছ' বছর এবং ছোটকাকা কৃষ্ণচন্দ্র তখন ঠাকুমার কোলে মাত্র দেড় বছরের শিশু। শিবচন্দ্র হঠাৎ এভাবে চোখ বুজতেই তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা আমার ঠাকুমাকে ঠকিয়ে ঠাকুর্দার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি লুটেপুটে নিয়ে তিনটি শিশুসহ বিধবা ঠাকুমাকে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছিল। বাদ পড়েছিল শুধু মদন ঘোষ লেনের এই বাড়ীটা। সত্যিকথা বলতে কি, সংসার চালাতে আমার ঠাকুমা রত্নমালা দেবী শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন আমাদের এই বাড়ীটা এক ভদ্রলোকের

কাছে ভাড়া দিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সেই দুর্দিনে আমার বাবার মামারা সেদিন তাদের সামর্থ্য মতো পাশে এসে না দাঁড়ালে , এই দে পরিবারের চালচিত্রটাই হয়তো একেবারে অন্যরকম হয়ে যেতে পারতো।

ঠাকুর্দা ✓শিবচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর পর খুব দুঃখ - দারিদ্রের মধ্য দিয়ে বাবা- কাকাদের দিন কাটলেও ঠাকুমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমার বাবা -কাকাদের লেখা-পড়ায় কোনদিনই কোন বিঘ্ন ঘটেনি। আমার বাবা ছিলেন সে আমলের স্নাতক। উনি চার্টার্ড ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। মেজকাকা হেমচন্দ্র দে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। এত অভাব অনটনের মধ্যেও তিনি ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছিলেন। আমার ছোটকাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে ছিলেন একজন আশ্চর্য রকমের প্রতিভাধর মানুষ। কিন্তু মাত্র তের বছর বয়সে হঠাৎ একদিন অন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁর তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হয়তো তেমন ভাবে হতে পারেনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিখুঁত ইংরেজী , উর্দু , হিন্দীতে উনি যে ভাবে অনর্গল জ্ঞান গর্ভ আলোচনা করতে পারতেন এবং সেসব শুনে হিন্দী -উর্দুর পণ্ডিতেরা পর্যন্ত যেভাবে তাঁর তারিফ করতেন , তাতেই হয়তো ছোট কাকার প্রতিভার কিছুটা আঁচ পাওয়া যাবে। আমাদের পরিবারে সংগীতের প্রবেশ মূলতঃ আমার এই ছোট কাকার হাত ধরে। এর আগে আমাদের বংশে গান- বাজনার চর্চা ছিলনা বললেই চলে। আমার ঠাকুর্দা কোনদিন গান বাজনা করেননি, সেকথা আগেই বলেছি। আমার বাবারও গানের ব্যাপারে তেমন কোন active participation আমি কোন দিন দেখিনি বা শুনিওনি। তবে হ্যা , তাঁদের একটা শখের অর্কেষ্ট্রা পার্টি ছিল। সেখানে আমার মেজকাকা হেমচন্দ্র দে ক্ল্যারিওনেট বাজাতেন। আমার বাবা নিজে কোন কিছু বাজানোয় অংশ না নিলেও নীরব শ্রোতা হিসাবে উনি সবসময় সেখানে থাকতেন। পরবর্ত্তীতে ছোটকাকা যখন " রঙমহল " থিয়েটারটা কিনে নিলেন , তখন ও দেখতাম মেজ-কাকা সেই থিয়েটারের আলোকসম্পাত ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে সক্রিয় অংশ নিতেন। আমার বাবাও সেখানে যুক্ত থাকতেন ঠিকই, তবে সেটা কোন পারফর্মিং আর্টের ক্ষেত্রে নয়। তিনি ছিলেন "রঙ মহল "এর সর্ব্বময় অধিকর্তা। অর্থাৎ ম্যানেজার আমার আগে এবং আমার ছোট কাকাকে বাদ দিলে এই হচ্ছে আমাদের পরিবারের সংক্ষিপ্ত সাংগীতিক ইতিবৃত্ত। পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় সংগীত জগতে আমাদের পরিবারের যা কিছু নাম-যশ, সবই আমার ছোট কাকা ✓কৃষ্ণচন্দ্র দে'র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদানের ফসল।

আমাদের পরিবার ছিল আক্ষরিক অর্থেই একান্নবর্ত্তী পরিবার। আমার বাবা কাকারা সবাই জন্মেছেন এবং বড় হয়েছেন মদন ঘোষ লেনের এই বাড়ীতে পরবর্ত্তী প্রজন্মে আমরা খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো সব ভাই - বোনেরাও এই বাড়ীতেই জন্মেছি এবং বড় হয়েছি একই ছত্রছায়ায়। আমরা চার ভাই এক বোন। বড়দা প্রণব চন্দ্র দে। ছোট কাকার কাছেই ওঁ গান শিখেছিল। খুব মিষ্টি গানের গলা ছিল ওঁর । এক সময়ে নিউ

থিয়েটার্সের দু 'নম্বরে ছোটাই মিত্তিরের সংগীত পরিচালকও হয়েছিল দাদা। 'সুধার প্রেম' , 'হেরফের' , ' বকুল' , ' প্রিয় বান্ধবী ' , 'কঙ্কাল ' ইত্যাদি বেশ কিছু ছবিতে সুরও দিয়েছিলেন তিনি। পরে কি যে হল ! ব্যাঙ্কের চাকরীতে ঢুকে গান-বাজনা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। আমার মেজদা ডঃ প্রকাশ চন্দ্র দে , কলকাতার একজন নামী ডাক্তার। মেজদা কোনদিনই গান-বাজনার দিকে আসেনি।পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতো সারাদিন। আমি তৃতীয়। আমার ছোট ভাই প্রভাস। প্রভাস চন্দ্র দে। সে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ত এবং পাশাপাশি কাকার কাছে গান শিখতো। ধ্রুপদ - ধামার কীর্ত্তন খুবই ভালো গায় প্রভাস। স্বনামধন্য রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সুবিনয় রায়ের কাছে বহুদিন ধরে রবীন্দ্র সংগীতও সে শিখেছে। " রাখী ", " কাঁকনতলা লাইব্রেরী "ইত্যাদি বেশ কিছু ছবিতে প্রভাস কাকার সহকারী সংগীত পরিচালক হিসাবেও কাজ করেছে। প্রভাসের সুর করা বহু ভজন ইত্যাদি কাকা যেমন বহুবার আকাশবাণী থেকে গেয়েছেন, আমারও " কী দেখলে তুমি আমাতে " , " ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে " বা " সারা বছরের গান " ইত্যাদি বহু জনপ্রিয় গানেরও সার্থক সুরকার প্রভাস। সবাই মিলে ওকে একবার ফিল্মের হিরো বানানোরও চেষ্টা হয়েছিল। বীণা আমাদের একমাত্র বোন। বড় আদরের ছোট বোন।খুব মিষ্টি গানের গলা ছিল ওর।এখন সে সব শুধুই স্মৃতি।

আমার ছেলেবেলা তেমন কোন উল্লেখনীয় ব্যাপার নয়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ীর ছেলেপুলেরা যে ভাবে মানুষ হয় , সেভাবেই আমরা জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো সব ভাই - বোনেরা একসাথে বড় হয়েছি। হয়তো আমাদের সংসারে অর্থের আতিশয্য তেমন কিছু ছিলনা, কিন্তু অভাবও ছিলনা কোন কিছুর। যখন যেটা খেতে চেয়েছি , পরতে চেয়েছি , সবই সাথে সাথে আমরা পেয়ে যেতাম। অন্যরা এটা খাচ্ছে, ওটা পরছে কিন্তু আমরা তেমনটা পাচ্ছিনা , এরকম অভাব বোধ আমাদের কোনদিনই হয়নি । বিশেষত বাবুকাকার জন্যই সেটা হতে পারেনি। উনি নিজেতো বিয়ে থা করেন নি। আমরাই ছিলাম সন্তানের মতো বা তার চেয়েও বেশী। এবং আমরা সব ভাই-বোনেরাই ছিলাম কাকা গত প্রাণ। আমাদের কার বল লাগবে , কার ব্যাট লাগবে, কার কি লাগবে সমস্ত আব্দার পূরণ করতেন বাবু কাকা। উনি যা রোজগার করতেন , তার অনেকটাই খরচ করে দিতেন আমাদের ভাই বোনেদের চাহিদা মেটানোর খাতে।

আমাদের পাড়াতে " ইন্দু ভূষণ মাষ্টারের পাঠশালা " ব'লে তখন একটি ছোট পাঠশালা ছিল। ইন্দুভূষণবাবু ছিলেন অবিভক্ত বাংলার ঢাকা জেলার লোক। অপরাপর ভাই বোনেদের মতো আমারও শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল ইন্দুভূষণ বাবুর এই পাঠশালাতেই। এখানে একটা কথা বিশেষ ক'রে বলা দরকার যে , তখনকার দিনে গুরুমশায়ের পাঠশালাই হোক বা নামীদামী স্কুল-কলেজেই হোক , সর্বত্র

পড়াশোনার একটা সুস্থ পরিবেশ ছিল। এখনকার মতো এমন অরাজক অবস্থা, শিক্ষা ব্যাবস্থা নিয়ে রাজনীতিকদের এমন দুর্নীতি পরায়ণতা, সবকিছু ভুলে শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনের দিকে ছুটতে থাকা, ছাত্রদের দ্বারা অধ্যক্ষ চব্বিশ ঘন্টা ঘেরাও হয়ে থাকা, এসবগুলো তখন কেউ স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারত না। তাই সেদিন গুরুমশায়ের পাঠশালাতে আমাদের যেভাবে তৈরী করা হয়েছিল, তাতে সেই ছেলেবেলাতেই একটা কথা অন্তত আমরা খুব ভালো ভাবে বুঝে গিয়েছিলাম যে, পড়াশোনা ছাড়া জীবনে কোনদিন বড় হওয়া যায় না। বাড়ীতেও মেজকাকা হেমচন্দ্রের মধ্যে পড়াশোনা নিয়ে অদম্য উৎসাহ দেখে দেখে আমরা খুব inspired হতাম। উনি সব সময় বলতেন Education is not a collection of certificates. You must have to know, what is what in this world. সেইজন্যই সবসময় উনি আমাদের বই পড়ার দিকে অনুপ্রাণিত করতেন। ছেলেবেলার সেই শিক্ষার সুফল আজ এই বয়সেও আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি। এখনও ছোটদের ছড়ার বই থেকে শুরু করে রাজনীতির বই, দর্শনের বই, সবেতেই আমার সমান উৎসাহ। আমার খুব ভালো লাগে বড় বড় মানুষের আত্মজীবনী পড়তে। কী সব অমূল্য জীবন। "যারা জীবনের গায় জড়িয়ে দেয় ভয়ঙ্কর উচ্চাভিলাষ"। অথচ " ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে সেই সব মানুষ, যারা মৃগনাভির মতো"।

ইন্দু মাষ্টারের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত ক'রে আমি এসে ভর্ত্তি হলাম স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুলে। বোধ হয় সেটা ১৯২৬ - ২৭ সনের কথা। তখন আমাদের হেডমাষ্টার ছিলেন স্যার জে. হেন্সম্যান সাহেব। হেন্সম্যান সাহেব নিজে যেমন খুব ডিসিপ্লিনড ছিলেন, তেমনি স্কুলের প্রত্যেকটি কাজকর্মও অবশ্যই ডিসিপ্লিনড ওয়েতে হ'ত। লেখাপড়া ঠিকমত না করলে, স্কুলের নিয়ম -কানুন ঠিকমতো না মানলে, নিয়মিত ঠিক সময়ে স্কুলে না এলে, সেই ছাত্রকে তিনি স্কুলে থাকতে দিতেন না। পড়াশুনায় আমি খুব ভালো ছিলাম না কোনদিনই। তবে যেটুকু পড়াশোনা করতাম, তাতে অন্তত প্রতি বছর ভালোভাবে পাশ ক'রে যেতাম। পড়াশোনার কথা ছেড়ে দিলে আমার জীবনে কলেজিয়েটের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হ'ল, - ডিসিপ্লিন। স্যার হেন্সম্যান সাহেবকে দেখে দেখে এবং তার নির্দেশমত চলে ডিসিপ্লিন ব্যাপারটা আমার মধ্যে এমন ভাবে গেঁথে গেছে যে, এই চুয়াত্তর বছর বয়সেও 'ডিসিপ্লিন' আমার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গান -বাজনা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই সব সময় আমি ডিসিপ্লিন মেনে করে গেছি। এবং এত ডিসিপ্লিন ভাবে কাজ করতে গিয়ে আমার কর্মস্থান বম্বে ও কলকাতার ফিল্ম -ইন্ডাষ্ট্রির লোকজনদের সাথে প্রায় প্রত্যেক দিনই আমার কথা কাটাকাটি হ'ত। হয়তো কোন গানের রিহার্সালের সময় ঠিক হ'ল সকাল দশটা। সবাইকে সেভাবে বলে দেওয়া হ'ল। কিন্তু রিহার্সালের সময় দেখা গেল আমিই হয়তো স্টুডিওর রিহার্সালরুমে সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বসে আছি,

অথচ আমার সহকর্মীদের পাত্তাই নেই। পরিচালক , যন্ত্রীরা , সহগায়ক - গায়িকা এক এক ক'রে সবাই যখন এসে উপস্থিত হলেন , দেখা গেল বেলা গড়িয়ে ঘড়িতে তখন দুপুর ১২টা। এব্যাপার গুলো আমি একেবারে সহ্য করতে পারতাম না। আমার কথা হ'ল , then why didn't you fix the time at 12 noon ? তাহলে এভাবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে করে আমার অনর্থক সময় নষ্ট করতে হ'ত না। কিন্তু না , সারা জীবন এত চেষ্টা করেও ওদেরকে আমি ডিসিপ্লিন ব্যাপারটা শেখাতেই পারি নি। সবাই যার যার খুশী মত আসতো এবং ঐ ভাবেই রিহার্সাল হত , গান রেকর্ড করা হত। কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে ওদের ইনডিসিপ্লিনড কাজকর্ম বরদাস্ত করতে না পেরে গান রেকর্ডিং না করেই স্টুডিও থেকে আমি বাড়ী চলে গেছি। হয়তো সে গান আমি আর কোনদিনই গাই নি। ডিসিপ্লিন ব্যাপারটাকে আমি এত গভীরভাবে মেনে চলি। কিন্তু আশ্চর্যের কথা,ওদের এই ইনডিসিপ্লিনড কাজকর্মই একদিন আমার মত ডিসিপ্লিনড্ মানুষের জীবনে আশীর্বাদ রূপে নেমে এসেছিল ।

সম্ভবতঃ সেটা ১৯৫০ সালের ঘটনা। হিন্দী গানের জগতে তখন আমার কিছু নাম- টাম হয়েছে। সে সময় লতা (মঙ্গেশকর) এসে একদিন আমায় বললে -" মান্নাদা আমি আপনার সুরে বাংলা গান গাইব। আমাকে দুটো বাংলা গান তৈরী করে দিন।" তখন আমি গৌরীকে অর্থাৎ বিখ্যাত গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে বললাম , - " আপনি দুটো গান লিখে দিন , লতা গাইবে বলছে।" গৌরীবাবু লিখে দিলেন , আমিও আমার সাধ্যমত খুব সুন্দর সুর করেদিলাম , লতাকে ভালো করে রিহার্সালও করানো হ'ল। এমন কি রেকর্ডিং এর ক্ষণ - তারিখও ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু রেকর্ডিং এর দিন যথা সময়ে দেখা গেল রেকর্ডিষ্ট, যন্ত্রী সকলেই স্টুডিওতে উপস্থিত , কিন্তু লতা বাঈয়ের আর দেখা নেই। সময় পার হয়ে গেল , কিন্তু লতা আর সেদিন এলোই না। আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল সেদিন, এলিনা এলিনা , কিন্তু একটা খবর পর্যন্ত নেই ! যাইহোক, এদেরকে নিয়েই ইন্ডাষ্ট্রিতে আমাকে কাজ করতে হবে , এই ভেবে লতার সাথে কথা ব'লে আবার একদিন রেকর্ডিং এর দিন ঠিক করা হ'ল। কিন্তু আশ্চর্য্য , সেদিনও লতা এলোনা এবং কোন খবরও পাঠালোনা। অনেক কষ্টে রাগ চেপে আবার ওর সাথে কথা বল্লাম এবং সপ্তাহ খানেক পরে নতুন করে রেকর্ডিং এর দিন ঠিক করা হ'ল। কিন্তু আশ্চর্য , তৃতীয় বারও সেই ঠিক একই ঘটনার পুনারাবৃত্তি। লতা বাঈ সেদিনও রেকর্ডিং মিস করলো। আমার রাগ তখন এত চ'ড়ে গিয়েছিল যে , যন্ত্রীরা তো সব প্রস্তুতই ছিল , বল্লাম "আপনারা বাজান, আমিই গাইবো এ গান "। গেয়েদিলাম। রেকর্ডও বাজারে এলো। খুলে গেল আমার জীবনের অন্য দিগন্ত। সেই আমার জীবনের প্রথম বাংলা গান গাওয়া " হায় হায় গো রাত যায় গো", "কত দূরে আর নিয়ে যাবে বল , কোথায় পথের প্রান্ত "।

ছেলেবেলাতেই একটি ধারণা আমার মধ্যে দৃঢ়মূল হয়েগিয়েছিল যে, জীবনের যে ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিনা কেন, সে ক্ষেত্রে বড় মাপের কিছু একটা আমাকে অবশ্যই হতে হবে। ভিতরের এই উচ্চাশা বা দূর্লভ লক্ষ্যে পৌঁছনোর আত্মিক তাগিদকে জাগিয়ে তুলতে আমাদের পরিবারের ইতিবাচক ধ্যান-ধারণা যেমন আমাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে, তেমনি সেক্ষেত্রে আমাদের পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবও আমার জীবনে অপরিসীম, উত্তর কলকাতার যে অঞ্চলে আমার জন্ম, ভারতবর্ষের শিল্প-সাহিত্য - দর্শনের আকাশে সে অঞ্চলের অবদান আজও সূর্যের মতো ভাস্বর। আমাদের এই বাড়ীতেই জন্মেছেন ভারতীয় সংগীতের যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব সংগীতাচার্য কৃষ্ণ চন্দ্র দে। আমাদের ঠিক পাশের গলিতেই গৌরমোহন মুখার্জী লেনে জন্মেছেন স্বামী বিবেকানন্দের মতো বিরল জন্মা পুরুষ। একটু এগিয়ে গেলেই জোড়াসাঁকো, রবীন্দ্র নাথের জন্মস্থান। অর্থাৎ এককথায় বলা যায়, বাংলার বহু মনীষীবৃন্দই, জন্মেছেন আমাদের বাড়ীর এক কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে। যেদিকে যাই আকাশে বাতাসে শুধুই তাঁদের অবিস্মরণীয় কীর্ত্তির বহমান গর্বিত মিঠে হাওয়া। বিবেকানন্দ তিরোহিত হয়েছেন মাত্র কয়েক বছর আগে। তখনও প্রত্যেকের মুখে মুখে অনুরণিত হচ্ছে তাঁর সেই বজ্রঘোষী বাণী -"উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান নিবোধত"। বাড়ীতেও দেখতাম আমার বাবা- কাকারা, যারা স্বামীজীকে চাক্ষুস দেখেছেন, তাদের মুখেও সবসময় স্বামীজীর কথা হচ্ছে। সব মিলিয়ে বল্গাহীন হাজারো ঘোড়ার তেজ যেন আমাদের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে একটা প্রাণ চাঞ্চল্যের শিহরণ জাগিয়ে যেত। সবসময় মনে হোত আমাদেরকেও এঁদের মতো বড় হতে হবে, অনেক বড়। তার অর্থ এই নয় যে, আমরা ভাবতাম বড় সন্ন্যাসী হ'ব অথবা কবি হব। এঁদের কথা শুনে শুনে, একটা কথা আমরা খুব স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম যে জীবনে বড় হতে হ'লে এঁদের মতো সমর্পিত প্রাণ হ'তে হবে। এঁরা আমার জীবনে নেহাৎ বইয়ের পাতার মহাপুরুষ ছিলেন না। একেবারে ছিলেন যেন প্রেরণার জীবন্ত মূর্ত্তি। অথচ আজ "সেই সব ছলবলে নদীরাও শুকিয়ে গেছে মানচিত্রে, যাদের মুখস্থ ছিল মহাদেবের জটার ঠিকানা"।

আমরা চার ভাইয়ের মধ্যে আমি ছিলাম একটু দস্যি প্রকৃতির, চঞ্চল এবং ভীষণ রগচটা স্বভাবের। আমার জন্ম প্রতীক হচ্ছে বৃষ। যে কারণেই সমস্ত কাজকর্মেই আমার স্বভাবটা বৃষের মতো এক বগ্‌গা। ভাবখানা এমন যে, যেদিকেই যাবো, একেবারে তেড়েফুড়ে বের হয়ে যাবো। সব সময় অন্যকে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যাবার একটা মন আমার মধ্যে কাজ করে। একেবারে সেই ছেলেবেলা থেকে। ছেলেবেলায়ও কেউ যদি খেলাধূলোয় আমাকে টেক্কা দেবার চেষ্টা করতো, খুব গাঁট্টা দিতাম। আমার স্বভাবটাই এরকম। একটু রাফ পার্সোনালিটি। যাই হোক, ছেলেবেলায় আমি খুব দস্যি প্রকৃতির ছিলাম এবং খুব খেলাধূলো করতাম।

খেলাধূলো করতাম মানে কী ! খেলাধূলোয় তখন আমার এত উৎসাহ ছিল, এত ইনভলভ্মেন্ট ছিল যে অন্যরা তো কোন্ ছার, আমি নিজেও হয়তো কল্পনা করতে পারিনি যে বড় হয়ে সংগীতই হবে আমার জীবনের একমাত্র আদরের ধন। কারণ তখন সব সময় আমি সঙ্গীসাথী জুটিয়ে সারাদিন শুধু খেলা নিয়ে পড়ে থাকতাম। এমন কোন খেলা ছিল না যা আমি ছেলেবেলায় খেলিনি। একেবারে ছেলেবেলা থেকেই গুলি ডান্ডা খেলা , সাতখোল্লাম খেলা , কাবাডি খেলা , টেনিস বল দিয়ে ফুটবল খেলা , ছাতার বাঁট দিয়ে হকি খেলা , যাহোক কিছু একটা চওড়া মতো কাঠ পেলেই তিনটে ইঁট সাজিয়ে ক্রিকেট খেলা , হাতে তৈরী ব্যাট দিয়ে চা-এর টেবিলের ওপর টেবল-টেনিস খেলা , এসব খেলাধূলো নিয়েই আমার ছেলেবেলার বেশীর ভাগ সময় কেটে গেছে। গায়ে- গতরে বেশ একটু সাবালক হয়ে ওঠার পর এই সমস্ত খেলাধূলোয় আমি আরো বেশী ক'রে জড়িয়ে পড়েছিলাম। খেলাধূলোয় আমার এত উৎসাহ ছিল যে , পরে যখন বড় হয়ে কাকার সাথে কাজ করতে বম্বে চলে যাই , তখনও আমি, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট রবীন চ্যাটার্জী এবং আরও অনেকে মিলে আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তায় ফুটবল, ক্রিকেট সবকিছু খেলতাম। খেলতে গিয়ে কতদিন কত জনের যে দরজা-জানালার কাঁচের শার্সি ভেঙ্গে দিয়েছি , কত যে গালাগাল খেয়েছি , কত যে ভরতুকি দিয়েছি , তার ইয়ত্ত্বা নেই। এত প্রবল ছিল আমার ক্রীড়াপ্রীতি।

ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রীতে আর একজন ফুটবল পাগল মানুষ ছিলেন শচীন কর্ত্তা, অর্থাৎশচীন দেব বর্মন। ওরকম ফুটবল প্রেমিক মানুষ খুব কম দেখা যায়। শচীনদা নিজেতো খুব ভালো **টেনিস খেলতেনই**, সেই সঙ্গে স্পোর্টসের যে কোন কিছুতেই , বিশেষত ফুটবলের ব্যাপারে তাঁর ছিল দারুণ উৎসাহ। কোথাও ফুটবল খেলার খবর পেলেই হল , শচীনদাকে কিছুতেই আর স্টুডিওতে রাখা যেত না। হয়তো গান নিয়ে কিছু একটা সিরিয়াস কাজ করছি, হঠাৎ উনি এসে বল্লেন, - " ওখানে ফুটবল ম্যাচ আছে, আজ গান-বাজনা সব বন্ধ।" ব্যাস , স্টুডিওর কাজকর্ম বন্ধ করে আমরাও সব দলবেঁধে শচীনদার সাথে লোকাল ট্রেন ধরে চলে যেতাম ম্যাচ দেখতে। খেলা দেখতে দেখতে যেভাবে শচীনদা উত্তেজিত হয়ে উঠতেন , জয়ের উল্লাসে যেভাবে নাচানাচি শুরু করে দিতেন , দেখে মনেই হত না যে , লোকটার এত বয়স হয়েছে। শচীনদার প্রিয় টিম ছিল ইস্টবেঙ্গল। আমার হ'ল মোহনবাগান। হয়তো দুজনেই পাশাপাশি বসে রোভার্স কাপ বা অন্য কোন ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল- মোহনবাগানের খেলা দেখছি , হয়তো ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের চিরকালীন সেই হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ের পর ইস্টবেঙ্গল সেদিন একটি গোল খেয়ে গেল। আমার তো তখন আনন্দের আর সীমা থাকতো না। হয়তো সবে আনন্দে একটু হৈ হৈ করে উঠেছি কি না উঠেছি, ব্যস অমনি সেই মুহূর্তেই শচীনদার ফরমায়েশ এলো , - "আমার পান শ্যাষ হইয়া গেছে, পান আইন্যা দে।" যত বলছি যে একটু

অপেক্ষা করুন ,খেলা শেষ হলেই এনে দেবো , কিন্তু কে কার কথা শোনে ! ওনার ঠিক তক্ষুনি পান চাই-ই - চাই। আসলে উনি তখন যেভাবেই হোক পাশ থেকে আমার মত একজন মোহনবাগান সমর্থককে হটিয়ে দিতে পারলেই যেন বেশী খুশী হতেন। এরকম ফুটবল পাগল মানুষ ছিলেন শচীন কর্ত্তা। এমন ও হয়েছে যে ইস্টবেঙ্গল যদি কোন খেলায় কোনদিন হেরে যেতো , শচীনদা মনে মনে এত আঘাত পেতেন যে দু - তিনদিন আর দুঃখে লজ্জায় স্টুডিওতে মুখই দেখাতেন না। বাঙ্গালীর ফুটবলপ্রীতির এরকম হাজারো অভিজ্ঞতার সার্থক সাঙ্গীতিক রূপায়নই বোধ হয় " ধন্যি মেয়ে " ছবিতে গাওয়া আমার সেই সাড়া জাগানো গান , - " সব খেলার সেরা বাঙ্গালীর তুমি ফুটবল "। এছাড়া " মোহনবাগানের মেয়ে " এবং মতি নন্দীর উপন্যাস নিয়ে বাংলা ছবি " স্ট্রাইকার " এ-ও আমার প্রিয় খেলা,বাঙ্গালীর প্রিয় খেলা ফুটবল খেলা নিয়ে আমাকে দিয়ে দু'টো খুব ভালো গান গাওয়ানো হয়েছিল।বাংলা ছাড়া আর কোন ভাষাতে ফুটবল নিয়ে গান গাওয়া হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। বাঙ্গালীর এই তীব্র ফুটবল - প্রীতি সারা ভারতেই আজ সুবিদিত। বাংলার ইস্টবেঙ্গল - মোহনবাগান আজও ভারতীয় ফুটবলের পুরোধা। অথচ সেই ফুটবলকে কেন্দ্র করেই কয়েক বছর আগে ইডেনে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছিল, খেলার নামে খুনোখুনিতে যেভাবে ঝ'রে গিয়েছিল অতগুলো তরতাজা প্রাণ , একজন আজন্ম ফুটবল প্রেমিক হিসাবে, একজন সুস্থ সামাজিক মানুষ হিসাবে সেই ঘটনায় আমি সেদিন খুবই আঘাত পেয়েছিলাম। কলকাতার তথাকথিত ফুটবল- প্রেমিক খেলোয়াড় এবং দর্শকদের ওরকম বর্বর টীম- প্রীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার শৈল্পিক বিদ্রোহই ফুটে উঠেছিল সেই প্রেক্ষাপটে গাওয়া আমার সেই ব্যালাডধর্মী গান - " খেলা ফুটবল খেলা " তে। " ...... তোমরা আমার একটা কথাই রেখো। খেলার মাঠে কারো খোকা আর না হারায় দেখো " - এ শুধু সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কথার সমষ্টি নয় , এ শুধু গানের জন্য গান নয় , ফুটবলের মতো নির্মল আনন্দদায়ক খেলার বর্বর খেলোয়াড় এবং দর্শকদের প্রতি এ আমার একান্ত মানবিক আবেদন।

আমার ছোট কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দে'র বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন সেকালের স্বনামধন্য কুস্তিগীর যতীন্দ্র চরণ গুহ ওরফে গোবর বাবু। তিনি মাঝে মধ্যেই ছোটকাকার বন্ধু হিসেবে আমাদের বাড়ীতে আসতেন , গল্পটল্প করতেন। এরকমই একদিন তিনি কাকার সাথে দেখা করতে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। ঐ ঘরেতে বসে কাকার সাথে কথাবার্ত্তা বলছেন । একটু পরে কাকা আমাকে ডেকে বল্লেন , " মানা একটা সিগারেট জ্বেলে দিয়ে যাও তো।" কাকাতো চোখে দেখতে পেতেন না , তাই তাঁর কাজকর্ম সমস্ত কিছুই আমাদের ভাইদেরকেই দেখাশোনা করতে হ'ত। হয়তো উনি বললেন , "দাও তো , একটা পান দাও , " আমি ডাব্বা থেকে পান দিতাম। হয়তো বল্লেন " গানের খাতা থেকে ঐ ভজনটা একবার পড়ে

Deba Prasad Das

দাও তো" আমি পড়ে দিতাম। প্রথমে আমার বড় দা, পরে আমি এবং আমার পরে ছোট ভাই প্রভাস, কাকার এই সমস্ত কাজকর্ম গুলো দেখাশোনা করত। অন্যদিনের মতো সেদিনও আমাকে ডেকে কাকা একটা সিগারেট জ্বেলে দিতে বলেন। পনেরো - ষোল বছরের ছেলে হিসাবে আমি তখন দেখতে বেশ বড় সড় হয়ে গেছি। হাঁটাচলা কথাবার্তা সবেতেই বেশ একটা ছটফটে ভাব। কাকা ডাকতেই, এক দৌড়ে এসে যখন কাকাকে সিগারেটটা জ্বেলে দিচ্ছি, গোবর বাবু একনজরে আমাকে আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে বাবুকাকাকে জিজ্ঞেস করলেন, - " কেষ্টবাবু, এই ছেলেটি কে! বেশ গাট্টাগোট্টা হয়ে গেছি দেখছি। " কাকা বল্লেন, - " আরে, ও তো মানা। বড়দার সেজোছেলে। " তখন গোবরবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, - " তুমি কী কর? " আমি বললাম - " পড়ি "। " পড় তো নিশ্চয়, সঙ্গে আর কী কর? " বল্লাম - " খেলি "। " কী খেলো? " আমি একধারে ফুটবল, ক্রিকেট, গুলিডান্ডা, হাডুডু ইত্যাদি যা যা খেলা খেলতাম, সব এক নিঃশ্বাসে বলে দিলাম। উনি বল্লেন, "একসারসাইজ কর না? " বল্লাম, - " এই তো একসারসাইজ, আবার কী একসারসাইজ করবো! " উনি বল্লেন, - "ঠিক আছে, কাল থেকে তুমি আমার আখড়ায় যাবে। কুস্তি লড়বে। " খেলাধুলো, হৈ - হুল্লোড় এসবতো চলছিলই, সেই সঙ্গে পরদিন থেকে গোবরবাবুর ১৯ নং গোয়াবাগান স্ট্রীটের আখড়ায় নিয়মিত অনুশীলন শুরু হয়ে গেল জুজুৎসুরও।

গোবরবাবুর আখড়ায় কুস্তির বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি আমার খুব ভালো লাগতো। ওখানে কুস্তি লড়ার মূল মন্ত্রই ছিল to defend yourself আজকাল যেমন ক্যারাটে, জুডো ইত্যাদি নানান মার্শাল আর্টের প্রচলন হয়েছে, ওসবতো তখন ছিল না, তখন ঐ কুস্তিটাই ছিল আমাদের মার্শাল আর্ট। কুস্তি বলতেই লোকের মনে সেই যে একটা ছবি ভেসে ওঠে, মোষের মত শরীর তৈরী করা, তারপর রদ্দা মারামারি, ঘাড় ভেঙ্গে দেয়া, নাক চেপটে দেয়া, এসবগুলো গোবরবাবুর আখড়ায় আমরা কোনদিনই দেখিনি। ঐ যে the art of wrestling, সেইটে গোবরবাবু খুব ভালো বুঝতেন। তাই তাঁর আখড়ায় লড়াইটা হ'ত খুবই বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে। গোবরবাবুর এক একজন শাগরেদকে দেখলে কি সুন্দর যে লাগতো, আহা! beautiful; সুস্থ -সতেজ-সুপুরুষ বলতে যা বোঝায়, এরা প্রত্যেকেই ছিল ঠিক তাই। যা হ'ক, গোবরবাবুর আখড়ায় কয়েকবছর অনুশীলন করার পর উনি যখন দেখলেন যে আমি কুস্তিটা বেশ আয়ত্ত্ব করে ফেলেছি, তখন ধীরে ধীরে এখানে- ওখানে আয়োজিত কুস্তি প্রতিযোগিতায় উনি আমাকে যোগ দেয়াতে আরম্ভ করলেন। এই ক'রে ক'রে ইন্টার কলেজ কুস্তি প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে " সারা বাংলা কুস্তি প্রতিযোগিতা" তেও আমি যোগ দিয়েছিলাম। All Bengal wrestling competition এ আমি ফাইনাল রাউন্ডে পৌঁছে বেশ সুনামও

কুড়িয়ে ছিলাম সে সময়।

গোবরবাবুর বড় ছেলে রতন , মেজছেলে মানিক, ছোট ছেলে জহর এবং আমরা অন্যান্য সকলে একসাথে ঐ আখড়ায় কুস্তি লড়তাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কুস্তি লড়িয়ে ছিল গোবর বাবুর মেজোছেলে মানিক। All India Heavy weight এ মানিক যেদিন champion হয় , সেদিন ওর সাফল্যে আমাদের স্কুল পর্যন্ত ছুটি হয়ে গিয়েছিল। পড়াশোনাতে ও মানিক বেশ ভালই ছিল। পরে কাস্টম্‌স বিভাগের বড় অফিসারও হয়েছিল সে। কলেজ স্ট্রীটে এখন যেখানে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হয়েছে ,সেখানে প্রতি বছর তখন সারা বাংলা কুস্তি প্রতিযোগিতা হ'ত , আমরা সব মিলে সেখানে কুস্তি লড়তে যেতাম। আমার মনে আছে , আমি , মানিক, রতন সব মিলে একবার বাসে করে এই কুস্তি প্রতিযোগিতায় যাচ্ছিলাম,বাসে উঠেই কন্ডাক্টরকে বলে দেয়া হ'ল যে, আমরা সব ইউনিভার্সিটি স্টপেজে নামব।স্টপেজ আসতেই আমরা ঘন্টাও দিলাম,কিন্তু বাস থামলো না। আমরা বললাম , " কি ব্যাপার,এখানে তো একটা স্টপেজ আছে , আপনাকে বলেছিও যে আমরা এখানে নামবো , ঘন্টাও দিয়েছি , বাস থামলো না কেন ?" এককথা দু-কথায় কথা কাটাকাটি হ'তে হ'তে কন্ডাক্টর কী একটা বাজে মন্তব্য করতেই রতন তাঁকে ধ'রে টানতে টানতে নীচে নামিয়ে, দে মার। এমনিতেই সব কুস্তি লড়তে যাচ্ছে , রক্ত গরম। তাইতে কন্ডাক্টর আবার কী অযৌক্তিক মন্তব্য করেছে , আর যায় কোথা !

খেলাধুলো এবং কুস্তি লড়ার পাশাপাশি জিমনাস্টিক এবং ঘুড়ি ওড়ানোতেও ছোট বেলায় আমার খুব উৎসাহ ছিল। জিমনাস্টিকে ট্রাপিজের খেলা গুলো আমার খুব ভালো লাগতো। কুস্তি লড়ার পাশাপাশি সেগুলোও বহু দিন আমি অনুশীলন করেছিলাম তখন। আর ছিল ঘুড়ি ওড়ানো।ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারে নিজেকে আমি বলি একজন প্রফেশনাল ঘুড়ি উড়িয়ে। ছেলেবেলায় বাড়ীর ছাদে দাঁড়িয়ে ঘুড়ি ওড়াতাম আর খালি গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খুব গান গাইতাম। আমার বাবা- কাকারাও ঘুড়ি ওড়ানোয় খুব উৎসাহী ছিলেন। এবং আমার বাবা আমাকে একটি বড় লাটাই কিনে দিয়েছিলেন , যেটি এখনও আমার কাছে সুরক্ষিত আছে। যুবা বয়সে আমি এত ভালো ঘুড়ি ওড়াতাম যে, আমি যখন ঘুড়ির প্যাঁচ লড়তাম , লোকেরা সব রাস্তায় ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতো আমার ঘুড়ির প্যাঁচ দেখবার জন্য। পরে যখন আমি বম্বে যাই , তখন ওখানেও ঘুড়ি ওড়ানোয় আমার খুব নাম হয়েছিল। বান্দ্রাতে একটা পার্কের উত্তর দিকে থাকতাম আমি এবং দক্ষিন দিকে থাকতো বিখ্যাত গায়ক মহম্মদ রফি। রফিরও ঘুড়ি ওড়ানোর খুব শখ ছিল। ওড়াতোও খুব ভালো । কিন্তু যখনই রফির ঘুড়ি উড়ত , কিছুই করতে হ'ত না আমাকে, শুধু আমার ঘুড়িটাকে একটু নীচে ফেলা আর তুলে দেওয়া। ব্যাস আর দেখতে হ'ত না , রফি **মিঞা** রঘুড়ি ভোকাট্টা। সবসময় আমি রফির ঘুড়ি কেটে দিতাম।

রফি আশ্চর্য হয়ে যেত যে , দিনের পর দিন কি ক'রে একটা লোক প্রত্যেক বার তাঁর ঘুড়ি কেটে দিচ্ছে ! দেখা হলেই রফি আমাকে বলতো , - "আরে মান্না দাদা, ক্যা আপ কুছ্ জাদুটোনা করতে হ্যায় , কি যব যব ম্যায় পেঁচ লড়তা হু , তো আপ মেরে পতঙ্গ কাট দেতে হ্যায় !!" আমিও মজা ক'রে বলতাম , " হ্যা , ভাই সমঝলো কি কুছ জাদুটোনা হি হ্যায়।" আসলে হ'ত কি, আমি সবসময় ভালো জায়গা থেকে অর্ডার দিয়ে ঐ বড় মাপের দোঁতে ঘুড়ি তৈরী করিয়ে আনতাম। ঘুড়ি ওড়াতাম সেই রকমই বড় লাটাইতে, যেটা আমার বাবা আমাকে ছেলেবেলায় কিনে দিয়েছিলেন। তারপর হচ্ছে আমার ভালো মাঞ্জা। আমি মাঞ্জা আনাতাম লক্ষ্ণৌ অথবা আহমেদাবাদ থেকে অর্ডার দিয়ে। এই দু-জায়গার মাঞ্জাতো ভারত বিখ্যাত। তারপর হ'ত কি , ওখানে হাওয়াটা সবসময়ই প্রায় হ'ত উত্তর থেকে দক্ষিণে , অর্থাৎ আমার বাড়ীর দিক থেকে রফি মিঞার বাড়ীর দিকে এবং ওটাই হ'ত আমার জন্য একটা বাড়তি সুবিধে। হাওয়ায় ভরপুর আমার ঐ ওজন দার ঘুড়ি , ভালো মাঞ্জা এবং আমার সেই বাঙ্গালীর টেনেখেলার রীতি , এসব কিছু মিলে প্রতিবারই কেটে যেত রফি মিঞার ঘুড়ি। বম্বেতে তখন আমার নামই হয়ে গেয়েছিল , "পতঙ্গ ওড়ানেকা যাদুগর।" আজ এই চুয়াত্তর বছর বয়সেও কি মিষ্টি সে সব স্মৃতি। আহা ! কিন্তু দিন এগিয়ে যায়। "কৈশোরের কিশলয়, পর্ণে পরিণত হয় , " আমার কন্ঠেও আনমনে গুনগুনিয়ে ওঠে -" সোনার এ দিন গুলো স্বপ্নের দিন গুলো ঝ'রে যায় , যাবে ঝ'রে , যাবে ঝ'রে ....।"